আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পর্যায় (الْمَرْحَلَةُ الْأُوْلٰ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

জীবনধারায় বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন (أَثَرُ الْمَعْنَوِيَاتِ فِي الْمُجْتَمِعِ):

ইসলামী রাষ্ট্র ও মহা বিজ্ঞানময় মুসলিম সমাজের এ ক্রান্তি লগ্নে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক নতুন জীবনধারার ভিত্তি স্থাপন করেন। এ জীবনধারার বাহ্যিকতা প্রকৃতপক্ষে ঐ আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতারই প্রতিবিম্ব (রশ্মি) ছিল যাকে নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গ ও সাহচর্যের বদৌলতে অভাবনীয় এক সম্মানের আসনে সমাসীন করা সম্ভব হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর শিষ্যদের দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করতেন এবং অবিরামভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

তিনি তাঁর শিষ্যগণকে সদা-সর্বদা ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা, সম্মান, সম্ভ্রম এবং উপাসনা, আনুগত্য ও আদবক্বায়দার তালীম দিতেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা মেনে চলার জন্য প্রেরণা ও পরামর্শ দান করতেন।

একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ

‘কোন্ ইসলাম উত্তম? অর্থাৎ ইসলামের কোন্ আচার-আচরণটি উৎকৃষ্ট?’ তিনি বললেন,

[تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ]

‘তুমি খাদ্য খাওয়াও এবং চেনা-অচেনা (লোককে) সালাম দাও’’।[1]

আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করলাম যে, এ কমনীয়, রমণীয়, সুষমাস্নিগ্ধ ও উজ্জ্বলতামন্ডিত মুখমণ্ডলটি কোন মিথ্যুক মানুষের হতেই পারে না (এবং তার মুখ নিঃসৃত যে প্রথম বাণীটি শ্রবণ করেছিলাম তা ছিল,

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوْا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ]

‘হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সালাম দেয়ার রেওয়াজ প্রবর্তন কর, খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় কর এবং রাত্রি বেলা মানুষ যখন নিদ্রাসুখে মগ্ন থাকবে তখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাক। (তবে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[2]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন,

[لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ]

‘‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদে না থাকে।[3]

তিনি আরও বলেছেন,

[الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ]

‘‘(প্রকৃত) মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহবা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।[4]

তিনি আরও বলেছেন,

[لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ]

‘তোমাদের মধ্যে কেউই (প্রকৃত) মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অপর ভাইয়ের জন্য ঐ সকল জিনিস পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।’[5]

তিনি আরও বলেছেন,

[المُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ، إِنْ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كَلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ]

‘‘সকল মু’মিন একটি মানব দেহের মত, যদি তার চোখে ব্যথা হয় তাহলে সমগ্র দেহেই ব্যথা অনুভূত হবে, আর যদি মাথায় ব্যথা হয় তাহলে তার সমগ্র শরীরেই ব্যথা অনুভূত হবে।[6]

তিনি আরও বলেছেন,

[المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً]

‘‘মু’মিন মু’মিনের জন্য একটি দালান ঘরের মতো, একাংশ অপর অংশকে শক্তি দান করে। [7]

তিনি আরও বলেছেন,

[لَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ]

‘‘নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না, রাগ করবে না, একে অপর থেকে মুখ ফিরাবে না, আল্লাহর বান্দা ও আপোষের মধ্যে ভাই ভাই হয়ে থাকবে। কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তিন দিনের বেশী তার ভাইয়ের সাথে ক্রোধবশত কথা বার্তা বলবে না।[8]

তিনি আরও বলেছেন,

[الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

‘মুসলিম মুসলমানের ভাই, না তার প্রতি অন্যায় করবে আর তাকে শত্রুর হাতে অর্পণ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাতে থাকবেন। কোন মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। আর কেননা মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।’[9]

আরও বলেছেন,

[اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ]

‘তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি সদয় হও, আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।’[10]

তিনি আরও বলেছেন,

[لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلٰى جَانِبِهِ]

‘ঐ ব্যক্তি মুসলিম নহে, যে পেট পুরে খায় অথচ তার পাশেই প্রতিবেশী অনাহারে কালাতিপাত করে।’[11]

আরও বলেছেন,

[سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ]

‘মুসলিমগণকে গালি দেয়া ফিসক (পাপ) তাদের হত্যা করা কুফুরী কাজ (অবিশ্বাসের কর্ম)।’[12]

এভাবে তিনি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করাকে সদকা বলে গণ্য করতেন এবং এটাকে ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে একটি শাখা বলে গণ্য করতেন।[13]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দান-খয়রাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং এ সবের এমন এমন ফযীলত বর্ণনা করতেন যেদিকে মন এমনিতেই আকৃষ্ট হতো। তিনি বলতেন যে, সদকা এবং দান-খয়রাত পাপকে এমনভাবে মুছে ফেলে যে, যেমন পানি আগুনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।[14]

তিনি আরো বলেছেন,

[أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلٰى عُرى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلٰى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِماً عَلٰى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ مِنْ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ]

‘‘কোন মুসলিম যদি কোন নগ্ন মুসলিমকে কাপড় পরিয়ে দেয় তা হলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিয়ে দিবেন এবং কোন মুসলিম যদি ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাদ্য খাওয়ায় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন এবং কোন মুসলিম যদি কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করায় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে মোহরকৃত পবিত্র শরাব পান করাবেন।[15] তিনি বলেছেন,

[اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمَرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ]

‘‘আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো যদিও খেজুরের অর্ধাংশ দিয়েও হয়, তাও যদি না পাও তা হলে কমপক্ষে ভাল কথার দ্বারা ভিখারীকে তুষ্ট করো।[16]

অথচ ভিক্ষা বৃত্তি হতে বিরত থাকার জন্য চরমভাবে নিষেধ করেছেন, ধৈর্যধারণ এবং অল্পতে সন্তুষ্ট হওয়ার ফযীলত শুনাতেন, ভিক্ষুকগণের ভিক্ষাবৃত্তিকে তাদের মুখমণ্ডলে আঁচড়, পাচড়ও ক্ষত আখ্যায়িত করেছেন।[17] অবশ্য সীমাতিরিক্ত নিরুপায় হয়ে যারা ভিক্ষা করে তাদেরকে এর বাইরে রেখেছেন।

কোন ইবাদতের কী ফযীলত এবং আল্লাহর নিকট তার কী সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে সে সবও তিনি আলোচনা করতেন। উপরন্তু, তাঁর নিকট যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হতো মুসলিমগণকে তার সঙ্গে শক্তভাবে জড়িয়ে রাখতেন। সেই সকল আয়াত তিনি মুসলিমগণকে পড়ে শোনাতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের তা পড়ে শোনাতে বলতেন। উদ্দেশ্য ছিল এ কাজের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে বুঝ-সমঝ ও চিন্তাভাবনার উদ্রেক এবং দাওয়াতের যোগ্যতা, পয়গম্বরত্বের অনুভূতি ও সচেতনতার সৃষ্টি করা।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণের সুপ্ত সম্ভাবনা সমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবত্বের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁদের উন্নীত করেন এবং জাগতিক ও পারত্রিক ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে আল্লাহর চেতনা ও ন্যায়-নীতির প্রতি নিবেদিত ও সমর্পিত এমন এক মানবগোষ্ঠির গোড়াপত্তন করেছিলেন ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। এ মানবগোষ্ঠির মধ্যে তার সাক্ষাৎ শিষ্যদের বলা হতো সাহাবী (রাঃ)। মান-মর্যাদা এবং মানবত্বের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের স্থান ছিল নাবী রাসূলগণের পরেই। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'যার অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে সে অতীত মানবগোষ্ঠির অনুসরণ করুক কেন না, জীবিতদের ব্যাপারে ফিৎনার ভয় রয়েছে।'

'অতীত মানবগোষ্ঠি' বলতে তিনি সাহাবীগণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা নাবী (ﷺ)–এর সঙ্গী ছিলেন। নাবী (ﷺ)–এর এই উম্মত-গোষ্ঠি ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানব, সব চাইতে পুণ্যবান, সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সব চাইতে নিবেদিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিজ নাবী (ﷺ)–এর বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান-ব্রতে শরীক হওয়ার দুর্লভ সুযোগ দানে ধন্য ও সম্মানিত করেছেন। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে তাঁদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। কারণ, তাঁরা ছিলেন হিদায়াত প্রাপ্তির উজ্জ্বলতার দৃষ্টান্ত।[18]

অন্যদিকে আবার, আমাদের পয়গম্বর রহাবারে আযম (ﷺ) সেরা পথপ্রদর্শক নিজেও এরূপ মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি, আল্লাহ প্রদত্ত পয়গম্বরত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, মান-মর্যাদা মহানচরিত্র এবং সুন্দর সুন্দর কাজ-কর্মের অধিকারী ছিলেন যে, তার সংস্পর্শে এলে মন এমনিতেই তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ত। ফলে তাঁর মুখ থেকে যখনই কোন কথা বের হতো তখনই সাহাবীগণ (রাঃ) তা বাস্তবায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। হিদায়াতের যে সকল কথা তিনি বলতেন জীবন-মরণ পণ করে সাহাবীগণ (রাঃ) তা সর্বাগ্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যেতেন।

আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক চেতনায় উজ্জীবিত প্রেরণাবোধ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে নাবী কারীম (ﷺ) মদীনার সমাজ জীবনে এমন এক জীবনধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন অখন্ড মানব জাতির ইতিহাসে যা ছিল সর্বোচ্চ মানের এবং সর্বাধিক পূর্ণত্বপ্রাপ্ত। এ জীবনধারায় তিনি এমন সব নিয়মনীতি এবং আচার-আচরণ প্রবর্তন করলেন যা যুগ-যুগান্তর ধরে অব্যাহত থাকা শোষণ, শাসন ও নিষ্পেষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানব জীবনকে শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তির আস্বাদে ভরপুর করে তুলে এ জীবনধারার উপাদানগুলোকে এমন উঁচু মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করা হয়েছিল যে, যুদ্ধ এবং শান্তি সকল অবস্থার সঙ্গেই সর্বাধিক যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা করে যে কোন পরিস্থিতির মোড় নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার মতো যোগ্যতা মুসলিমগণ অর্জন করেছিলেন। মুসলিমগণের এহেন পরিবর্তিত জীবনধারা কিছুটা যেন আকস্মিকভাবেই ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দেয়।

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৬ ও ৯ পৃঃ।

[2] তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমি, মিশকাত ১ম খন্ড ১৬৮ পৃঃ।

[3] সহীহুল মুসলিম, মিশকাত ২য় খন্ড ৪২২ পৃঃ।

[4] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৬ পৃঃ।

[5] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৬ পৃঃ।

[6] সহীহুল মুসলিম, মিশকাত ২য় খন্ড ৪২২ পৃঃ।

[7] মুত্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত ২য় খন্ড ৪২২ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৮৯০ পৃঃ।

[8] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৮৯৬ পৃঃ।

[9] মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ২য় খন্ড ৪২২ পৃঃ।

[10] সুনানে আবূ দাউদ ২য় খন্ড ৩৩৫ পৃঃ, জামে তিরমিযী ২য় খন্ড ১৪ পৃঃ।

[11] বাইহাকী, শোআবুল ঈমান, মিশকাত ২য় খন্ড ৪২৪ পৃঃ।

[12] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৮৯৩ পৃঃ।

[13] মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ১ম খন্ড ১২ ও ১৬৭ পৃঃ।

[14] আহমাদ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১ম খন্ড ১৪ পৃঃ।

[15] সুনানে আবূ দাউদ, জামে তিরমিযী, মিশকাত ১ম খন্ড ১৬৯ পৃঃ।

[16] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ১৯০ পৃঃ ২য় খন্ড ৮৯০ পৃঃ।

[17] দ্রষ্টব্য, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ১ম খন্ড ১৬৩ পৃঃ।

[18] রাযীন, মিশকাত ১ম খন্ড ৩২ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6169

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন